গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১৭ সংখ্যা | ৯ - ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জন্মশতবর্ষে
কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

"পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধের আবেদন অনেক আগেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধও আজ প্রায় নিঃশেষিত। অথচ সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী মতাদর্শ ও নতুন মূল্যবোধ দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ও সমাজজীবনে আজও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে না পারার ফলে আদর্শ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলেই দেশের নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই সর্বাত্মক সংকট।"

(ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য)

দেউলিয়া রাজনীতি তরজায় মত্ত

'আচ্ছা বলুন তো রাজ্যে মানুষের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি কী?' প্রশ্নটি শোনামাত্র যে কেউ বলবেন, 'কেন মশাই আপনি কি এ রাজ্যে থাকেন না?' তারপরই গড়গড় করে বলে যাবেন, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, শিক্ষার দফরফা হয়ে যাওয়া, চিকিৎসার খরচ বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি অজস্র সমস্যা মানুষের জীবনকে জেরবার করে দিচ্ছে।

প্রশ্নটি উঠে এসেছে সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী ও বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর সভা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের তোলপাড় করা ঘিরে। দুজনেই একে অন্যের এলাকায় গিয়ে সভা করেছেন। অভিষেক করেছেন কাঁথিতে গিয়ে এবং শুভেন্দু করেছেন ডায়মন্ড হারবারে। সভার অনেক আগে থেকেই সংবাদমাধ্যম সেই খবরের ধারাভাষ্য চালিয়ে গেছে। উভয়েরই মুখে অনেক আগে থেকে 'লড়কে লেঙ্গে' ভাব। পরস্পরকে দোষারোপ। বুঝতে অসুবিধা হয় না, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন কড়া নাড়ছে। তার জন্যই উভয়ের এই তরজা, যা মিনিটে মিনিটে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে নিউজ চ্যানেলগুলি।

সভায় তাঁরা কে কী বললেন? প্রথমে দেখা যাক সরকারি দলের অন্যতম শীর্ষব্যক্তি অভিষেক ব্যানার্জী কী বললেন। যা বললেন তা শুনে বহু তৃণমূল সমর্থকও বলছেন, 'এ তো টিভির রিয়েলিটি শো! সাজানো বক্তৃতা। বাস্তবের ছোঁয়ামাত্র নেই।' কেন উঠছে এ কথা? কলকাতা থেকে কাঁথি যাওয়ার পথে বড় রাস্তার ধারে একটি গরিব পাড়ায় হঠাৎ অভিষেকের কনভয় থেমে যায় এবং তিনি নেমে পড়ে মানুষের সাথে কথা বলেন। মানুষ তাঁদের অভিযোগের কথা নেতাকে জানান। সেই বিষয়টিই অভিষেক সভায় তুলে ধরেন। বলেন, 'কাউকে না বলে একটা গ্রামে গেলাম। অনেকগুলি তফসিলি জাতি, উপজাতিভুক্ত পরিবার সেখানে থাকে। কী করুণ অবস্থা! বলছে প্রধান, উপপ্রধানকে জানিয়ে লাভ হয়নি। অথচ তাঁরা এমন কিছু চাইছেন না, যা তাঁদের চাওয়ার অধিকার নেই।' সভায় যারা তুমুল হাততালি দিয়ে নেতার পিঠ চাপড়েছেন তাঁরা পর্যন্ত জানেন এটা সত্যিই রিয়েলিটি শো। সাজানো কথা। ভোটের সময় নেতাদের এ সব বলতে হয়। এখন 'মিডিয়ার ফুটেজ' কথাটা নেতারা যেমন বোঝেন, তেমনই তাঁদের পিছনে ঘোরা জনতাও বোঝে। তাই মানুষ বলছে, জনগণের সুখ-দুঃখ নিয়ে কতখানি চিন্তিত তা দেখাতেই গরিব পাড়ায় কনভয় দাঁড় করানো। গ্রামবাসীদের অভিযোগের কথাগুলিই সভায় তুলে ধরা। এত কিছু মনে পড়ছে কি সামনে ভোট বলে? ক্যামেরার বন্দোবস্ত ছাড়া কি তিনি থামতেন, কথা শুনতেন? আরও প্রশ্ন তাঁদের, রাজ্যে এমন গরিব পাড়া কি ওই একটিই আছে? বাকি অজস্র মানুষ যে গরিবির অন্ধকারে তলিয়ে রয়েছেন, সে-কথা কি এই নেতা জানেন না? তাঁদের সরকারের বয়স তো প্রায় ১২ হতে চলল। কই তাঁদের দুঃখের কথা, বঞ্চনার কথা তো এর আগে কখনও এই নেতার মুখে শোনা যায়নি। কখনও কোনও গরিব মানুষের দরজায় তো তাঁকে এমন করে যেতে দেখা যায়নি! প্রধান,

দুয়ের পাতায় দেখুন

শিক্ষা গোল্লায় যাক, পুঁজিপতিদের চাহিদা মিটলেই চলবে
এটাই বিজেপির শিক্ষানীতি

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ প্রস্তুত করেছিল যে কস্তুরীরঙ্গন কমিটি, তাদের বক্তব্য ছিল—আমরা এই শিক্ষানীতির মধ্যে সমস্ত কিছুই নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে চেয়েছি, যা একুশ শতকের শিক্ষার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ যাঁরা তলিয়ে ভাবেননি এই 'একুশ শতকের আশা-আকাঙ্ক্ষা' কথাটার মানে ঠিক কী, আজ তাঁরা উদ্বিগ্ন এই শিক্ষানীতির রূপ দেখে।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আজ্ঞাবহ নরেন্দ্র মোদির পরামর্শদাতা আরএসএসের চিন্তাবিদদের আঁতুড়ঘরে প্রস্তুত এই শিক্ষানীতির মোড়কের মধ্যে রয়েছে বাছাই করা বেশ কিছু চমকদার শব্দবন্ধ। এই শিক্ষানীতি নাকি ভারতকে 'গ্লোবাল সুপার পাওয়ার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। 'আত্মনির্ভর ভারত' গঠনের একটা উচ্চতায় জাতিকে পৌঁছে দেবে। অনেকেই এসব শুনে গর্ব অনুভব করতেই পারেন। ভাবতেই পারেন, কোটি কোটি হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত ছাত্র- যুব-মহিলা, আপামর জনসাধারণের এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধেপ্রতিবাদ করার আবার কী আছে? কিন্তু না, এইসব শব্দবন্ধের আড়ালে লুকিয়ে ভয়ঙ্কর সব পরিকল্পনা। ইউজিসিকে দিয়ে একটা পর একটা সার্কুলার জারি করানো হচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান সহ জ্ঞানচর্চার যে প্রক্রিয়া আজও এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে যতটুকু রয়েছে তাকে অবলুপ্তির দিকে পাঠানো হবে। এক কথায় ভারতীয় নবজাগরণের মনীষী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জনসাধারণের টাকায় গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থাকে সংকুচিত করতে করতে ধীরে ধীরে বন্ধকরে দেওয়ার মারাত্মক পরিকল্পনা পাকা করে ফেলা হয়েছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ সম্পূর্ণ করতে, পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষাকে নিয়ে আসতে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে লাটে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি কোষাগারের একটা ভাল পরিমাণ অংশ যেখানে শিক্ষাখাতে ব্যয় করা, শিক্ষান্তে কাজ দেওয়ার যে দায়িত্ব জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের ছিল, তাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এরই পোশাকী নাম 'আত্মনির্ভর ভারত' গঠনের শিক্ষা। অতীতে যে ভারত অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সাহিত্যে, বিজ্ঞানে বিশ্বের কাছে সম্মানজনক স্থান অর্জন করেছিল, এই 'গ্লোবাল সুপার পাওয়ার' গড়ে তোলার লক্ষ্য কিন্তু তা নয়। এই 'গ্লোবাল সুপার পাওয়ার' গড়ে তোলার কারিগর হবে ভারতের মুষ্টিমেয়

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিজেপি-র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী কার্যকলাপের প্রতিবাদে

কালাদিবস পালন করুন

SUCI(C)

শহিদ ক্ষুদিরাম জন্মদিবস উদযাপন

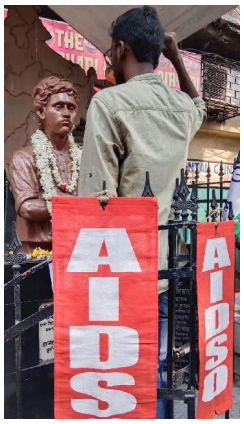

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১৩৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে ৩ ডিসেম্বর সারা দেশের নানা প্রান্তে অসংখ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, কমসোমল সহ নানা সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা শহিদের প্রতিকৃতি ও মূর্তিতে মাল্যদান, আলোচনা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সহ নানা কর্মসূচি সফল করে তোলেন। ক্ষুদিরামের অপূরিত স্বপ্ন—শোষণহীন ভারত গড়ার শপথ সর্বত্রই নেওয়া হয়। ছবিতে বাঁদিকে চণ্ডীগড়ে এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ডান দিকে এআইডিএসও-র উদ্যোগে কলকাতার বাগবাজারে ক্ষুদিরাম মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

প্রতি মাসে ধান কেনার শিবিরের দাবি

৩০ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা খাদ্য নিয়ামক দপ্তরে এ আই কে কে এম এস-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

প্রতি অঞ্চলে ধান কেনার শিবির, ঠিকাচাষি-ভাগচাষিদের ধান কেনার হয়রানি বন্ধ, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ সহ অন্যান্য দাবি তোলেন নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি উৎপল প্রধান, জেলা সম্পাদক জগদীশ সাউ, প্রবীর প্রধান, সামসেদ খান প্রমুখ। জেলা খাদ্য আধিকারিক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ধান কেনার বিশেষ শিবির সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া ব্লকের প্রবীণ পার্টি সদস্য কমরেড বনমালী পরামানিক ২৭ নভেম্বর বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যার মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর।

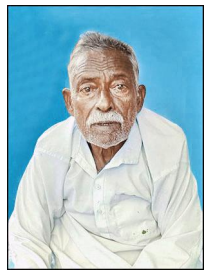

১৯৭০-এর দশকের একেবারে শুরুতে শালতোড়া ব্লকে সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা কমরেড মাধব রায়চৌধুরী বিস্তীর্ণ এলাকায় সাইকেলে অথবা পায়ে হেঁটে সংগঠনের কাজ করতেন। তাঁকে দেখে কমরেড বনমালী পরামানিক খুবই আকৃষ্ট হন। আলোচনায় এবং ব্যবহারে নতুন দিশা পেয়ে তৎকালীন সোস্যালিস্ট পার্টি পরিত্যাগ করে কমরেড বনমালী পরামানিক এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯৭২-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ছাতনা বিধানসভায় দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর থেকে দলে ক্রমাগত সক্রিয় ভূমিকা নিতে থাকেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং নেতৃত্ব পান কমরেড বাদশা খানেরও। গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন, মজুরি বৃদ্ধি, চাষির ভাগের অধিকার, গরিব আদিবাসী মানুষের জঙ্গলের এবং জঙ্গল এলাকায় জমি ও বসতবাড়ির অধিকার নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা সহ বহু ক্ষেত্রে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। এই ধারাতেই জেলায় কৃষক খেতমজুর সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। কিন্তু পরবর্তীকালে শারীরিক নানা প্রতিবন্ধকতায় আগের মতো ভূমিকা পালন করতে না পারলেও নিয়মিত দলের মুখপত্র সংগ্রহ করা, নিজে পড়া এবং অন্যদের পড়তে সাহায্য করতেন। কমরেডদের বুদ্ধি ও পরামর্শ দিতেন। তাঁর বোন বর্তমানে শালতোড়া লোকাল সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদিকা। তাঁকেও যথাসাধ্য সাহায্য করতেন, পরামর্শ দিতেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার কর্মী সমর্থক সহ বহু সাধারণ মানুষ সমবেত হন ও শ্রদ্ধা জানান। মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন নাগ এবং বিদ্যুৎ শীট।

কমরেড বনমালী পরামানিক লাল সেলাম

দেউলিয়া রাজনীতি তরজায় মত্ত

একের পাতার পর

উপপ্রধানের বিরুদ্ধে প্রতিটি পঞ্চায়েতে ঠিক এমনই দলবাজি, স্বজনপোষণ, চুরি, দুর্নীতি, সাধারণ মানুষের হয়রানির অজস্র অভিযোগ কি প্রতিদিন ভুক্তভোগীরা করছেন না? তা হলে তো তাঁদের সবাইকে পদত্যাগ করতে হয়। কই, কোথাও তো কোনও প্রধান, উপপ্রধানকে পদত্যাগ করতে হয়নি! তা হলে হঠাৎ অভিষেক তাঁর সভা থেকে এই দুজনকে পদত্যাগ করতে বললেন কেন? আসলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক মুখে অভিষেকের হাতে-গরম বক্তৃতার উপকরণ সংগ্রহের জন্য কোথাকার কে এক প্রধান এবং উপপ্রধানকে বলি দেওয়া হল এবং সব কিছু ছাপিয়ে এই নেতা কত কড়া প্রশাসক, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কত বড় যোদ্ধা উপস্থিত জনতার কাছে তা প্রমাণ করা গেল। এটাকেই মানুষ বলছেন টিভির রিয়েলিটি শো।

অভিষেক ব্যানার্জীর বক্তৃতার আর বাকি অংশেও কোথাও পাওয়া গেল না রাজ্য জুড়ে দুর্নীতির যে বিরাট স্রোত বইছে তাকে আটকানোর কথা, দুর্নীতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তি দেওয়ার কথা। শোনা গেল না চাষিদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার কথা, ফসল বিক্রি করতে গিয়ে চাষিরা যে মারাত্মক দুর্নীতির কবলে পড়ছে তার সুরাহার কথা। রাজ্যে ভয়াবহ বেকারত্ব দূর করতে রাজ্য সরকার কোনও জরুরি ব্যবস্থা নিচ্ছে কি না তেমন কোনও কথাই বক্তৃতায় উঠে এল না। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের দ্রুতগতিতে অধঃপাতে যাওয়া কী ভাবে রোখা যাবে, সে কথাও তাঁর বক্তৃতাতে ছিল না।

বক্তৃতার বাকি অংশটি জুড়ে ছিল শুধুই জনগণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু শুকনো কথা এবং বিরোধী দল এবং নেতার প্রতি অন্তঃসারশূন্য হুঙ্কার। এমনকি যে বিরোধী দলের নেতার সম্পর্কে তিনি এত হুঙ্কার ছাড়লেন সেই বিজেপির যে মারাত্মক ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, আধিপত্যবাদী রাজনীতি, সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে বিজেপি-আরএসএসের লোক বসিয়ে সেগুলিকে কুক্ষিগত করা এবং তার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে কবরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা, ইতিহাসকে বিকৃত করা— এ-সবের বিরুদ্ধে কোনও কিছুই তাঁর বক্তৃতায় এল না। এল না কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের সহযোগিতায় জনগণের উপর একচেটিয়া পুঁজির স্টিমরোলার চালানোর কথাও। জনস্বার্থ রক্ষা করতে এই রাজনীতির মোকাবিলায় তাঁরা আদৌ কোনও কর্মসূচি নিচ্ছেন কি না, সে রকম কোনও কথাই শোনা গেল না। স্বাভাবিক ভাবেই কিছু দলীয় স্তাবক ছাড়া বাকি শ্রোতারা ফিরলেন মুখ শুকনো করে।

ডায়মন্ড হারবারে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বক্তৃতায় কী বললেন? বললেন 'বিজয় উৎসবের' কথা। তিনি নাকি ডায়মন্ড হারবারে এ মাসেই বিজয় উৎসব করবেন। কীসের বিজয় উৎসব? না, তিনি বলেছেন এখনই তা বলবেন না। তবে উপস্থিত শ্রোতাদের তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এই বিরোধী নেতা বেশ কিছু দিন ধরেই 'ডেডলাইনের' কথা বলে চলেছেন। পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল সরকারের ডেডলাইন। কিন্তু তিনি এ কথা বলেননি যে রাজ্যে রাজ্যে কিংবা কেন্দ্রে বিজেপি যে সরকার চালাচ্ছে তার সাথে তৃণমূল সরকারের আদৌ কোনও ফারাক আছে কি না। তাঁদের হাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, ইডি, সিবিআই থাকা সত্ত্বেও কেন সারদা এবং নারদা দুর্নীতির তদন্ত মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল, সে প্রশ্নের জবাব তিনি দেননি। সিবিআই-ইডি তৃণমূল সরকারের পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতির যে তদন্ত করছে, কেন হাইকোর্টের বিচারপতি তা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করছেন, কেন তিনি বলছেন, আদৌ এই তদন্ত কোনও দিন শেষ হবে কি না জানি না, এই প্রশ্নের উত্তরও তাঁর বক্তৃতায় পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ তৃণমূল নেতার মতোই বিজেপি নেতার বক্তৃতাও জনস্বার্থের সাথে সম্পর্কশূন্য শুকনো কথার ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাস্তবে এইসব দলের সভাগুলি পরস্পরের প্রতি কু-কথা বর্ষণেরই মঞ্চ হয়ে উঠেছে। এমনি করেই ভোটবাজ এই সব দলগুলি জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয়গুলিকেই সামনে এনে জোর গলায় প্রচার চালায় যাতে মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলি সামনে আসতে না পারে। এই ভাবেই তারা মানুষকে ভোট রাজনীতিতে ফাঁসিয়ে দেয়। পুঁজিপতি শ্রেণির মালিকানায় চলা সংবাদমাধ্যমও প্রচুর হইচই তুলে এটাকেই আসল লড়াই বলে দেখায়। মানুষকে বোঝায় আন্দোলন কোরো না, এই তরজার থেকে একজনকে বেছে ভোট দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ ভাবেই তারা মানুষকে তাদের জীবনের মূল সমস্যাগুলোর আসল কারণটাকে জানতে দেয় না, আড়াল করে রাখে। মানুষও খবরের কাগজে, নিউজ চ্যানেলে অবিরাম এই প্রচার শুনে দেখে এই রাজনীতিতেই ফেঁসে যায়। ফেঁসে গিয়ে একবার এই দলকে ভোট দেয়, তারপর হতাশ হয়ে আবার ওই দলকে ভোট দেয়। তারপর মনে মনে বলতে থাকে, সবাই সমান, এ দেশে কিছু হবে না।

অথচ এই সাধারণ মানুষের হাতেই রয়েছে এই দলগুলির প্রতারণার রাজনীতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ক্ষমতা। তাঁরা যদি এই সব ভোটবাজ দলগুলির নেতাদের বক্তৃতা শুনে রাজনীতি বুঝতে চান তবে এই প্রতারণার রাজনীতি চলতেই থাকবে। ভোটরাজনীতির এই যাঁতাকল থেকে তাঁরা কোনও দিনই বেরোতে পারবেন না। এই চক্কর থেকে বেরোতে হলে রাজনীতিটা নিজেদের বুঝতে হবে। তার জন্য মাথা ঘামাতে হবে। এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে—যে দলই ক্ষমতায় বসছে কেন তাঁরা সবাই এমন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে? কেন ভোটের সময় যে সব প্রতিশ্রুতি এই সব নেতারা দেন, ভোটে জিতে ঠিক তার উল্টো কাজ করেন? গণতন্ত্রের যে বড়াই এই সব দলগুলি করে কেন তাতে জনগণের মতামতের কোনও মূল্য নেই? দুর্নীতিগ্রস্ত এই সব দলগুলির একজনকে সরিয়ে আর একজনকে বসালে শাসনের-শোষণের কোনও পার্থক্য কি ঘটবে? জনগণের প্রকৃত দাবি কীসে আদায় হবে? কেন দেশের কোটি কোটি মানুষের মাথার উপর যখন সামান্য একটু ছাউনি মিলছে না, তখন এক শ্রেণির মানুষের ঘরে টাকার পাহাড় জমছে?

মানুষের এই দুরবস্থা দূর করার সত্যিই কি কোনও রাস্তা আছে, থাকলে সেই রাস্তাটি কী? এই সব প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর পাওয়ার মধ্যেই রয়েছে জনস্বার্থ রক্ষার গ্যারান্টি। কিন্তু ভোটবাজ, ক্ষমতালোভী, দুর্নীতিগ্রস্ত এই সব নেতাদের বক্তৃতার থেকে এই সব প্রশ্নের কোনওটির উত্তর মিলবে না। তার জন্য খোঁজ করতে হবে বিপ্লবী রাজনীতির।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের মহন্ত বলছেন ‘আওরঙ্গজেবের থেকে বেশি মন্দির ভেঙেছেন মোদি’

২০১৯ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট যখন উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা গুঁড়িয়ে দেওয়া বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণ করার পক্ষে রায় দেয় এবং সেই নির্মাণের দায়িত্ব ধ্বংসকারীদের হাতেই তুলে দেয় তখন দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ চমকে উঠেছিল এবং সেই দিনটিকে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার পক্ষে কালো দিন রূপে চিহ্নিত করেছিল। পরবর্তী কালে সেই জঘন্য রায় যে বিচারকমণ্ডলী দিয়েছিলেন, তার মধ্যমণি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ অবসর নেওয়া মাত্রই কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত করায় বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতার দিকে পুনরায় আঙ্গুল ওঠে। কিন্তু অনেক শান্তিপ্রিয় মানুষ ভেবেছিলেন, যাক এবার অন্তত এই বিতর্কের অবসান ঘটবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদ যে সাধারণ মানুষ না চাইলেও এই দেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি চায় এবং এই বিভাজনই কেবলমাত্র তাদের শোষণের মেয়াদকে আরও বৃদ্ধি করতে পারে সেই কথাটা ঐ মানুষেরা বুঝতে পারেননি। তাই এক দাঙ্গার আগুন নিভতে না নিভতে দেশের অন্য স্থানে দাঙ্গা বাধানো হচ্ছে। ১৯৯২ সালে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় বিজেপি তথা সংঘ পরিবার শ্লোগান দিয়েছিল, “ইয়ে কেবল ঝাঁকি হ্যায়, আভি কাশী, মথুরা বাকি হ্যায়।” ২০১৯ থেকে ২০২২, মাত্র তিন বছর যেতে না যেতেই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পাশে জ্ঞানব্যপী মসজিদের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে ‘মা শৃঙ্গার গৌরী’-র যে বিগ্রহ আছে তাকে এখনকার মতো বছরে একদিন পুজো করার বদলে প্রতিদিন পুজো করার অধিকার দাবি করে বারাণসীর নিম্ন আদালতে একটি পিটিশন জমা দেন পাঁচ জন মহিলা। প্রসঙ্গত ওই পাঁচ মহিলাই বিজেপি-আরএসএসের সাথে যুক্ত। ওই পিটিশনে আরও দাবি করা হয় যে জ্ঞানবাপী আসলে মসজিদ নয়, একটি মন্দির। পিটিশনারদের যুক্তি হল, মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করেন এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের একটি অংশের উপরেই জ্ঞানবাপী মসজিদ তৈরি করা হয়। তাঁদের বক্তব্য, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মসজিদের কয়েক মিটার দূরেই বিশ্বনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ হয়ে থাকলেও হিন্দুরা বরাবরই জ্ঞানবাপী মসজিদে মা শৃঙ্গার গৌরী সমেত দৃশ্যমান ও অদৃশ্য দেবতাদের পুজো চালিয়ে গেছে। নিম্ন আদালত এই পিটিশনের ভিত্তিতে জ্ঞানবাপী কমপ্লেক্সে একটি সার্ভে চালানোর আদেশ দেয়।

জ্ঞানবাপী মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মসজিদ ইন্তেজামিয়া কমিটি এই পিটিশনের বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি ছিল, আদালত পিটিশনারদের রিলিফ দিতে পারে না, কারণ প্লেসেজ অফ ওয়ারশিপ অ্যাক্ট, ১৯৯১ অনুসারে কোনও উপাসনাস্থলের ধর্মীয় চরিত্র ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে যা ছিল তা-ই রাখতে হয়, বদলানো যায় না। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা পৌঁছলে আদালত বলে, ১৯৯১ সালের ওই আইনে কোনও উপাসনাস্থলের ধর্মীয় চরিত্র নির্ধারণে নিষেধাজ্ঞা নেই। সেই রায়ে বলীয়ান হয়ে একদল সমীক্ষক মসজিদের একাংশে খননকার্য চালিয়ে একটি প্রস্তর খণ্ড উদ্ধার করার সাথে সাথে হিন্দুত্ববাদীরা সেটিকে শিবলিঙ্গ বলে দাবি করে শোরগোল ফেলে দেয়। কিন্তু সম্প্রতি এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন জ্ঞানবাপী মসজিদের মহন্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ তিওয়ারি। একজন সাংবাদিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির তৈরি হয়েছিল সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায়। তিনি আরও দাবি করেছেন, আওরঙ্গজেব যত মন্দির ভেঙেছেন তার থেকেও বেশি মন্দির ভেঙেছেন নরেন্দ্র মোদি।

শ্রী তিওয়ারির মতে, দুই ধরনের ঐতিহাসিক আছেন। এক দল ইতিহাস রচনা করেন অতীতের সমস্ত কিছু বিচার করে। আর এক দল আছে ইতিহাসের জ্ঞান যাদের অগভীর, তারা ইতিহাস লেখে তাদের অ্যাজেন্ডা অনুযায়ী। এই দ্বিতীয় দলের কাছে মোগল যুগের ইতিহাস শুরু হয় ১৬৬৯ সালে আওরঙ্গজেবের নির্দেশে বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস দিয়ে। তার আগের বা পরের ইতিহাস তারা বলে না। তারা কখনও বলে না যে আকবর এই মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। তার কারণ তাদের উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে মুসলমানবিরোধী আবহাওয়া তৈরি করা আর হিন্দুদের আবেগকে ব্যবহার করে ভোট আদায় করা। এরা কারা প্রশ্ন করাতে শ্রী তিওয়ারি সরাসরি বিজেপি এবং আরএসএস-এর নাম গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, বিশ্বনাথের শিবলিঙ্গ স্মরণাতীত কাল থেকে এখানেই রয়েছে। কিন্তু আকবরই প্রথম ব্যক্তি যিনি ওই শিবলিঙ্গের গৃহ হিসাবে একটা বড়সড় মন্দির তৈরি করিয়ে দেন। ফলে সেই মন্দির ঐতিহাসিক। হিন্দুত্ববাদীরা কিন্তু আকবরের এই অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের কথা বলে না।

কিন্তু আওরঙ্গজেব কেন ওই মন্দির ধ্বংস করেন সেই প্রশ্নের জবাবে শ্রী তিওয়ারি তৎকালীন ইতিহাস স্মরণ করান। শাহজাহানের বড় ছেলে দারাশিকো, যাঁকে আকবরের যোগ্য উত্তরাধিকারী মনে করা হত, তিনি বারাণসীতে এসেছিলেন সংস্কৃত আর প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে। দারাকে যাঁরা পড়িয়েছিলেন সেই পরিবারের সদস্যরা এখনও বারাণসীতেই থাকেন। (কংগ্রেস নেতা কমলাপতি ত্রিপাঠীর পরিবার)। তাঁর এক পূর্বপুরুষই দারাশিকোর গুরু ছিলেন। গুরুদক্ষিণা হিসাবে দারা নিজের একটা কোঠি ত্রিপাঠী পরিবারকে দেন। সেটা বারাণসীর ঔরঙ্গাবাদ এলাকায়। যাইহোক, দারাশিকো বিশ্বনাথ মন্দিরের দায়িত্ব বর্তমান মহন্ত তিওয়ারিজির পূর্বপুরুষদের হাতে তুলে দেন। পাট্টায় লেখা আছে যে তাঁরা শৈব সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজন। তাই এই মন্দির এবং এর আচার অনুষ্ঠানের ধারা তাঁদের হাতে নিরাপদ।

সিংহাসনে বসার পর যারা দারার সমর্থক বা কোনও ভাবে দারাকে সাহায্য করেছিল অথবা যাদের দারার সাথে সুসম্পর্ক ছিল বলে আওরঙ্গজেবের মনে হয়েছিল, তাদের সকলকে উনি আক্রমণ করেন। উনি মনে করতেন তারা সবাই ওঁর প্রতিপক্ষ। তাঁদের পারিবারিক স্মৃতি বলে বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করার কারণও এটাই। অর্থাৎ ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়, দারাশিকোর সঙ্গে দ্বন্দ্বই বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসের কারণ।

কিন্তু বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করা আওরঙ্গজেবের একমাত্র পরিচয় নয়। ১৬৫৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আওরঙ্গজেব একটা ফরমান জারি করেন। সেটা এখনও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। সেই ফরমানে বলা হয়েছিল পুরনো মন্দির এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের রক্ষা করা উচিত। কিন্তু তিনিই আবার বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। অথচ কয়েক বছর পরে জঙ্গমবাদী মঠকে সাহায্য করেন, কুমারস্বামী মঠ নামে এক নতুন মঠ প্রতিষ্ঠার কাজেও সাহায্য করেন। আবার কেদার মন্দিরের সংস্কারের অনুমতিও দেন। এগুলো কি আওরঙ্গজেবকে হিন্দুবিরোধী প্রমাণ করে?

আওরঙ্গজেব জঙ্গমবাদী মঠকে চার-পাঁচ বিঘা জমি দিয়েছিলেন আর রাজকোষ থেকে কিছু টাকাও দিয়েছিলেন যাতে লিঙ্গায়তরা শিবপুজো এবং সংস্কৃত পুঁথির পাঠ চালিয়ে যেতে পারে। আওরঙ্গজেবের পাট্টা এখনও জঙ্গমবাদী মঠে আছে। ২০১৮ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ওই মঠে গিয়েছিলেন। মঠের লোকেরা বলেছে উনি ঐ পাট্টাটা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলতে চাইছিলেন। কিন্তু ওই পাট্টা তো ঐতিহাসিক নথি। আদিত্যনাথ চায় বলেই ইতিহাস থেকে বা স্মৃতি থেকে সেটা মুছে ফেলা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের মহন্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ তিওয়ারি।

এই ঘটনাটাই প্রমাণ করে আসলে যা করা হচ্ছে সবই একটা নির্দিষ্ট বয়ান তৈরি করার স্বার্থে। ইতিহাস আওরঙ্গজেবকে একজন একনায়ক, অত্যাচারী রাজা হিসাবে দেখিয়েছে। এটা ঠিকই যে উনি নিজের ভাইদের খুন করেছিলেন আর বাবাকে গারদে পুরেছিলেন। বিশ্বনাথ মন্দির তাঁর আমলেই ধ্বংস করা হয়েছিল। ফলে তাঁকে হিন্দুবিরোধী বলে দেখানো সহজ। বিজেপি-আরএসএস আওরঙ্গজেবের প্রচলিত ভাবমূর্তির সঙ্গে মন্দির ধ্বংসের ঘটনাকে জুড়ে তাঁকে আক্রমণ করে আর আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করার মধ্যে দিয়ে ভারতের মুসলমানদের আক্রমণ করে। শ্রী তিওয়ারি বলেছেন, হিন্দুত্ব অ্যাজেন্ডা সফল করার জন্য আওরঙ্গজেবকে দানব বানানো বিজেপি-আরএসএস-এর ড্রিম প্রোজেক্ট।

শ্রী তিওয়ারি বলেন, তাঁদের পরিবারের আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি ছিল না। যখন বোঝা গেল যে মন্দিরটা ভেঙে ফেলা হবে, তখন তাঁর পূর্বপুরুষরা শিবলিঙ্গটা তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের কাছে রাখেন যাতে ওটা সুরক্ষিত থাকে। এখনকার বিশ্বনাথ মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ রয়েছে সেটা তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত করা সেই শিবলিঙ্গ। তাঁরা ঠিক যেখানে বসিয়েছিলেন সেখানেই আছে। শিবলিঙ্গটা তাঁদের বাড়িতে রাখা ছিল। কোথায় আছে তাঁরা প্রকাশ করেননি। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পর তাঁদের পরিবার লোকজনকে জানায় শিবলিঙ্গ কোথায় আছে। তখন সকলে তাঁদের বাড়িতে সেটি দর্শন করতে আসে। হোলকার রাজপরিবারের সদস্যা অহল্যাবাঈ হোলকার ছিলেন শৈব। তিনি তিওয়ারি পরিবারকে অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন বাড়ির যে অংশে শিবলিঙ্গ রয়েছে সেই অংশটা তাঁর হাতে তুলে দেন। তাঁরা তাই করেন; সেখানেই নতুন মন্দির তৈরি হয়। বিশ্বনাথ মন্দিরের এখনকার জায়গায় একটা পাথরের ফলক আছে, যাতে মন্দিরের অতীত লেখা আছে।

সুতরাং, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের মহন্তের মতে আরও একটা শিবলিঙ্গের অস্তিত্ব ভিত্তিহীন। এই বছর (২০২২) বারাণসীর লোয়ার কোর্ট জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে একটা সার্ভে করিয়েছে। দাবি করা হয়েছে যে মসজিদে ওজু করার জন্যে যে জলের ট্যাঙ্ক আছে, তার মধ্যে একটা শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে। কিন্তু শ্রী তিওয়ারি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনে চার-পাঁচবার জলের ট্যাঙ্কটা পরিষ্কার করা হয়েছে; কোনও দিন কোনও শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়নি। যে ‘শিবলিঙ্গ’ উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে গুজব বলে উড়িয়ে দেন তিনি। তিনি এও বলেন যে জ্ঞানবাপী মসজিদে সর্বদাই মুসলিম ধর্মের মানুষেরা নামাজ পড়তেন, ধর্মীয় আচার পালন করতেন। কিন্তু কখনই মসজিদের অভ্যন্তরে পুজোপাঠ হত না। কেবলমাত্র বছরে একদিন (চৈত্র মাসের নবরাত্রির নবমীর দিন) মসজিদের পশ্চিম দিকের দেওয়ালের বাইরে মা শৃঙ্গার গৌরীর যে বিগ্রহ আছে তাকে পূজা করা হত। নরেন্দ্র মোদি এবং আদিত্যনাথেরা ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত মসজিদটাই মন্দির কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ তিওয়ারি আরও বলেছেন, কাশীতে আওরঙ্গজেব একটি মন্দির ভেঙেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে তাঁর স্বপ্নের প্রজেক্ট কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে গঙ্গা পর্যন্ত সরাসরি করিডোর বানাতে গিয়ে একই ভাবে প্রচুর প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। এই ধ্বংসের দায়িত্বও মোদির উপর চাপা উচিত। প্রায় ২৮৬টা শিবলিঙ্গ উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটা তো নর্দমায় ফেলা হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ১৪৬টা শিবলিঙ্গ উদ্ধার করা গেছে। বলা বাহুল্য বর্তমানে জীবিত কেউ আওরঙ্গজেবের বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করা দেখেনি, কিন্তু

চারের পাতায় দেখুন

আশা, আইসিডিএস কর্মীদের দিয়ে আবাস যোজনার কাজ করানোর ফরমান

তীব্র প্রতিবাদ আশাকর্মীদের

কেন্দ্রীয় সরকারের তুঘলকি ফরমানের বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় চলছে আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

২ ডিসেম্বর রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর থেকে সার্কুলার দিয়ে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ভেরিফিকেশনের কাজে রাজ্যের সমস্ত আশা এবং আইসিডিএস কর্মীদের ৩ ডিসেম্বর থেকেই নেমে পড়তে হবে এবং সাত দিনের মধ্যে এক দফা রিপোর্ট পেশ করতে হবে। এই ফরমানের তীব্র বিরোধিতা করেছে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন বলেন, রাজ্য সরকার হাজার হাজার শূন্য পদে নিয়োগ না করে যখনই স্বল্প সময়ের বিভিন্ন ধরনের কাজ আসে তখনই দপ্তর বহির্ভূত এই কাজ আশা, আইসিডিএস সহ স্কিম ওয়ার্কারদের উপর অন্যায় ভাবে চাপিয়ে দেয়। এই ধরনের কর্মীদের উপরে কাজের চাপ এমনিতেই খুব বেশি। তার উপর একের পর এক কাজের বোঝা সরকার চাপিয়েই চলেছে, যার বিষময় পরিণতিতে ওই কর্মীদের অনেকে মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছেন। এই অবস্থায় নতুনভাবে আবাস যোজনার চাপ ওই কর্মীদের আরও শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেবে। এটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

তিনি বলেন, আশাকর্মীরা এলাকার মানুষের পরিষেবা দেয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে থেকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর সংক্রান্ত ভেরিফিকেশনের কাজ কর্মীদের নতুন বিপদের মধ্যে ফেলবে। কারণ এ নিয়ে শুরু হয়ে গেছে নানা দুর্নীতি। কাদের নামে ঘর আছে সে সমস্ত তালিকা আগে থেকে তৈরি হয়েই আছে। এই প্রকল্পের ঘর, বরাদ্দ টাকা এই সমস্ত প্রশ্নে আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময় দেখেছি অনেক বেনিয়ম ও দুর্নীতি আছে। ফলে সঠিক ভাবে কাজ করতে গেলে শাসক দল সহ এলাকার মানুষের সাথে আশাকর্মীদের বৈরিতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় এই কাজ করতে গিয়ে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। বহু জায়গায় আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের এলাকায় হেনস্থা করা হয়েছে। জেলা এবং ব্লক আধিকারিকরা ট্রেনিং দিয়ে জোর জবরদস্তি সার্ভে করার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য দিকে লোকাল প্রশাসন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করছে এবং কে ঘর পাবে কে পাবে না এরকম নানা লিস্ট আশা কর্মীদের ধরিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ৫ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ভবনে সরাসরি মিশন ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দশ জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেয়। তাঁর কাছে সমস্ত সমস্যা তুলে ধরা হয়। এই বিষয় নিয়ে তিনি নিজেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং কথা দিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দ্রুত সমাধানের পদক্ষেপ নেবেন।

বিদ্যুৎ কোম্পানির ঠিকাকর্মী আন্দোলনের জয়

রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংবহন ও বন্টন কোম্পানিতে ঠিকাদারদের অধীনে স্থায়ী কাজে হাজার হাজার ঠিকাকর্মী রোদ, জল, ঝড়, বজ্রপাত ও হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল রাখার কাজে নিযুক্ত। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের উপর চলা দীর্ঘদিনের বঞ্চনা নিরসনের জন্য এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে পরিচালিত বিভিন্ন বিদ্যুৎ কর্মী সংগঠন সহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালনা করছে।

এই সংগঠনগুলি তুলে ধরে যে বিদ্যুৎ শিল্প রাজ্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরিভুক্ত শিল্পগুলির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে ঝুঁকিবহুল ও দুর্ঘটনাপ্রবণ এই শিল্পে নিযুক্ত ঠিকাকর্মীদের জবরদস্তি রাজ্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরিভুক্ত নির্মাণকর্মীদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। রাজ্যে একটার পর একটা সরকার পরিবর্তন হলেও ঠিকাকর্মীদের প্রতি এই অবিচার ও বঞ্চনার কোনও নিরসন হয়নি।

এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিদ্যুৎ মন্ত্রী, শ্রম মন্ত্রী, শ্রম কমিশনার, শ্রম দপ্তরের মুখ্য সচিব ও বিদ্যুৎ বন্টন কর্তৃপক্ষের কাছে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি তুলে ধরে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে, স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এই ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ঠিকা কর্মীদের শ্রেণি নির্ধারণ করে বেতন সংশোধনের বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাডভাইজারি বোর্ডে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু রাজ্যের শ্রম দপ্তর বিষয়টির নিষ্পত্তির ব্যাপারে টালবাহানা করতে থাকে। রাজ্যের শ্রম দপ্তরে পড়ে থাকা বিরোধের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে ২০২০-র জানুয়ারিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। ২০২১-এর জুলাই মাসে আদালত নির্দেশ দেয় তিন মাসের মধ্যে ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে আইন মোতাবেক বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ঠিকাকর্মীদের শ্রেণি নির্ধারণ ও বেতন সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করতে হবে। শ্রম দপ্তর ও বিদ্যুৎ বন্টন কর্তৃপক্ষ বিষয়টির নিষ্পত্তি না করায় গত ১৭ মার্চ ইউনিয়ন আদালত অবমাননার মামলা করে। এর পর ২২ নভেম্বর রাজ্যের শ্রম দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ শিল্পের ঠিকাকর্মীদের নির্মাণ শ্রমিকের পরিবর্তে আলাদা শ্রেণি নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে।

দীর্ঘ ৬৬ বছরের লড়াইয়ের পর বিদ্যুৎ শিল্পের ঠিকাকর্মীদের এই জয়ের মূল কারিগর এআইইউটিইউসি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। এই জয় পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎশিল্পে নিযুক্ত ঠিকাকর্মী সহ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে বিদ্যুৎ শিল্পের ঠিকাকর্মীদের এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে।

রূপনারায়ণের উপরে ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে

গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

হুগলি জেলার বন্দর এলাকায় রূপনারায়ণের উপর একটি কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দাবিপত্রে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু হল ২ ডিসেম্বর। ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটির ডাকে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি বলাই চন্দ্র পাড়ুই, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত মন্ডল ও মদনচন্দ্র রম, উপদেষ্টা দেবাশীষ মাইতি প্রমুখ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল এলাকার সাথে হুগলি জেলা খানাকুল ব্লকের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার্থে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এলাকার মানুষ এক কনভেনশনের মাধ্যমে তৈরি করেছেন ওই কমিটি।

মন্দির ভেঙেছেন মোদি

তিনের পাতার পর

অনেকেই মোদির দলবলকে হিন্দুদের আবেগের তোয়াক্কা না করে ঐতিহাসিক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে অসম্মান করতে দেখেছে। উদ্ধার হওয়া ওই ১৪৬টা শিবলিঙ্গ এখন লঙ্কার (বারাণসীর একটি এলাকা) থানায় আছে। থানাতেই রোজ পুজো হয়। করিডোর নির্মাণ করতে গিয়ে যেসব মন্দির ভাঙা হয় তাদের মধ্যে ছপ্পন বিনায়ক (গণেশ ঠাকুর) মন্দির রয়েছে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ সহ অনেকেই মন্দির ভাঙার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। বারাণসীর বাসিন্দা রমেশ উপাধ্যায় এবং কয়েকজন উকিল মিলে একটা পিটিশন ফাইল করেছিলেন। বক্তব্য ছিল তাঁদের প্রতিদিন ছপ্পন বিনায়কের পুজো করার অধিকার আছে। এই অধিকারও আবহমানকাল ধরে চালু আছে। কিন্তু সেই পিটিশন গৃহীত হয়নি। ওই পিটিশন গ্রাহ্য হলে ছপ্পন বিনায়ক মন্দির ভাঙা আটকে যেত। জেলা জজ সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে নোটিস দেন। দু-দিনের মধ্যে তাঁর ট্রান্সফার হয়ে যায়। তাঁর বদলে অন্য একজন জজ আসেন। এই নতুন জজ পিটিশনারদের বলেন তাঁদের মামলা উন্নয়নের পথে অর্থাৎ করিডোর তৈরির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

জ্ঞানবাপী নিয়ে যে পাঁচজন মহিলা পিটিশন ফাইল করেছেন তাঁদের মামলা কিন্তু ছপ্পন বিনায়ক কেসের মামলার পিটিশন যা দাবি করছিল তা-ই দাবি করছে। সুপ্রিম কোর্ট কেসকে লোয়ার কোর্ট থেকে জেলা কোর্টে ট্রান্সফার করে দেয়, আর জেলা কোর্ট বলে এই মামলা প্লেসেজ অফ ওয়ারশিপ অ্যাক্ট, ১৯৯১-এর আওতায় পড়ে না, অতএব গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এক দল হিন্দুর মামলা বাতিল করে দেওয়া হল, আরেক দল হিন্দুর মামলা গ্রহণযোগ্য হল। এ হল একই ধরনের দুটো কেসে দুটো আলাদা নীতি প্রয়োগের উদাহরণ। জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে মুসলিম-বিরোধী প্রচার চালানোর সুযোগ আছে বলে তার জন্য এক নীতি, আর করিডোর বানিয়ে ধর্মস্থানকে 'আধুনিক' করার জন্য প্রয়োজনে মন্দির ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত ভিন্ন নীতি। যারা মন্দিরকে 'মল' বানানোর বিরোধিতা করেছেন, তাদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, ফানে হুমকি দেওয়া হয়েছে, এমনকি কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের মহন্তের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদ তিওয়ারির মতে, হিন্দুত্ব স্রেফ নরেন্দ্র মোদি আর তাঁর পার্টির ব্যবসা। তিনি সোজাসুজি বলেছেন, নরেন্দ্র মোদি আওরঙ্গজেবের চেয়ে বেশি মন্দির ধ্বংস করেছেন।

(সূত্র ঃ নিউজ ক্লিক, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২)

ব্রিটেন জুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ

শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভে গত কয়েক মাস ধরে উত্তাল ব্রিটেন। সে দেশে প্রথম প্রতিবাদের ঢেউ তোলেন রেলকর্মীরা। তাঁদের আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে আসছেন আরও শত-সহস্র খেটে-খাওয়া মানুষ।

গত জুলাইয়ে মূল্যবৃদ্ধির হার যখন ৪০ বছরের রেকর্ড ছাড়ায় তখনই আন্দোলনে সোচ্চার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ব্রিটেনের পরিবহণ বিভাগের শ্রমিক-কর্মচারীরা। রেল, জলপথ ও সড়কপথের কর্মীদের সংগঠন আরএমটি-র নেতৃত্বে রেল-কর্মচারীরা প্রথম বিক্ষোভ দেখান। ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাড়তে থাকা সংসার-খরচ সামাল দিতে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে একের পর এক ধর্মঘট করেন তাঁরা। কর্তারা দাবি মানেননি। প্রতিবাদে এ মাসের মাঝামাঝি এবং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আরএমটি-র নেতৃত্বে ৪০ হাজারেরও বেশি রেল-কর্মচারী আবারও বেশ কয়েকটি ধর্মঘটে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শীতের শুরুতে ব্রিটেনের লিভারপুল ও ফেলিক্সস্টোয়েতে বন্দর-কর্মীরা নিজেদের দাবিতে ধর্মঘট করেছেন। আইনজীবী, কল-সেন্টারের কর্মী ও প্রযুক্তিকর্মীরা কাজ বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে।

নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখ ব্রিটেনের হাজার হাজার ডাক-কর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষকরা গোটা দেশ জুড়ে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন পোস্টঅফিস, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলগুলিকে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির এই কঠিন সময়ে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য বেতন বাড়ানোর দাবিতে স্কটল্যান্ডের শিক্ষকরা গত দশ বছরের মধ্যে এই প্রথমবার পথে নেমেছেন। ডাকবিভাগের কর্মীরা গত ২৫ নভেম্বরও ধর্মঘটে অনড় ছিলেন। আসন্ন খ্রিস্টমাসের আগে নিজেদের বিক্ষোভ-আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

রয়েল কলেজ অফ নার্সিং-এর নার্সিং স্টাফরা খুব শিগগিরই ধর্মঘটে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বেতন বৃদ্ধি ও রোগী-নিরাপত্তার দাবিতে নার্স-সংগঠনের ৩ লক্ষ সদস্য ধর্মঘট করে দাবি-দাওয়ায় সোচ্চার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত ১০৬ বছরে এই প্রথম ধর্মঘটে সামিল হতে চলেছেন নার্সরা।

দেশ জুড়ে খেটে-খাওয়া মানুষের এই সংগঠিত প্রতিবাদে ভয় পাচ্ছে শাসকরা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ শ্রমিক-কর্মচারীদের নিরস্ত করতে কিছু কিছু দাবি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে তারা। যেমন, অতি সম্প্রতি 'ইউনাইট' নামের একটি শ্রমিক সংগঠন জানিয়েছে, তারা 'হেইনজ' কারখানার ১৫০ জন কর্মীর ১১ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবি আদায় করেছে। ব্রিটেনের একটি বামপন্থী সংবাদপত্র মন্তব্য করেছে, 'বেতনবৃদ্ধির এই ঘটনায় বোঝা যাচ্ছে, শ্রমিকদের সোচ্চার প্রতিবাদে মালিকরা উদ্বিগ্ন। এটা ভাল লক্ষণ। তবে এ থেকে এ কথাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, মালিকরা ইচ্ছে করলেই কর্মীদের বেতন বাড়াতে পারে— সেই টাকার জোর তাদের রয়েছে।'

এদিকে টোরি নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি প্রতিক্রিয়াশীল বিল নিয়ে এসেছে। সেই বিলে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশের হাতে আরও বেশি ক্ষমতার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শ্রমিক প্রতিনিধিদের আশঙ্কা, এর ফলে ধর্মঘটের দিনে পিকেটিংরত আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি বর্বরতা আরও বাড়বে।

কিন্তু শাসকের বর্বরতায় আতঙ্কিত নন ব্রিটেনের শ্রমিক-কর্মচারীরা। একের পর এক রাজপথ কাঁপানো আন্দোলনে উজ্জীবিত ব্রিটেনের শ্রমিক-কর্মচারীরা আরও বেশি সংখ্যায় শ্রমিক-সংগঠনের সদস্য হচ্ছেন। সংগঠনগুলিতে যেভাবে সদস্যসংখ্যা বাড়ছে, গত দশ বছরে তা কখনও দেখা যায়নি। শ্রমিক-কর্মচারীরা একে অপরের কাছ থেকে আন্দোলনের কলাকৌশল শিখে নিচ্ছেন, নিজের নিজের কাজের জায়গায় মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিচ্ছেন।

ঝাড়খণ্ড জুড়ে বিরসা মুণ্ডা জন্মদিবস উদযাপন

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহিদ বিরসা মুণ্ডার জন্মদিবস ১৫ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল এআইডিএসও। রাজ্যের পূর্ব সিংভূম, পশ্চিম সিংভূম, সরায়কেলা খরসাওয়াঁ, বোকারো, রাঁচি সহ অন্যান্য জেলায় বিরসা মুণ্ডার মূর্তিতে মাল্যদান, সভা, ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়।

পূর্ব সিংভূমের জামশেদপুরে বিরসা মুণ্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করেন সংগঠনে রাজ্য সভাপতি সমর মাহাতো। এই জেলারই পোটকায় বিরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সংগঠনের মানপুর গ্রাম কমিটি গঠিত হয়। পশ্চিম সিংভূমের চাইবাসায় মূর্তিতে মাল্যদানের পাশাপাশি সভা হয়। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্পোর্টস কমিটি তৈরি হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সামিল হয় শিশু-কিশোররা। সরায়কেলা খরসাওয়াঁতে বিরসা মুণ্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। বোকারোর চন্দনকিয়ারীতে অনুষ্ঠানে বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সামসুল আলম। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক সোহন মাহাতো।

বিজেপির শিক্ষানীতি

একের পাতার পর

পুঁজিপতি গোষ্ঠী, যারা দেশের মানুষকে শোষণ করতে করতে মুনাফার পাহাড় তৈরি করেছে। তারা যাতে বিশ্বের দরবারে সুপার পাওয়ার হয়ে উঠতে পারে, তারই উপযোগী সিলেবাস, পঠন-পাঠন তৈরি করা হচ্ছে। তাদের আরও বেশি পরিমাণ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার। সেজন্য, সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুণগত কোনও পার্থক্য রাখা হবে না। প্রয়োজনে দু'ধরনের প্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যার গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ'।

সরকার উচ্চশিক্ষায় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইছে কিছু তথাকথিত স্বশাসিত সংস্থার আড়াল নিয়ে। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন, নীতি-আয়োগের মতো স্বশাসিত সংস্থাগুলির স্বাতন্ত্র্যকে ধুয়ে মুছে ফেলে কিছু স্তাবক শিক্ষাবিদকে সঙ্গে নিয়ে আরএসএসের চিন্তকমণ্ডলীর তৈরি করা শিক্ষার নকশাকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। সেই লক্ষ্যেই ইউজিসিকে দিয়ে একটার পর একটা সার্কুলার জারি করে চলেছে। শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষাবিদদের যুক্ত করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নীতি নির্ধারণের যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, তাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে সরকার স্বৈরতান্ত্রিক পথে হাঁটছে। অতি সম্প্রতি ইউজিসি-কে দিয়ে তৈরি করা 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউশন' এবং 'প্রফেসর অফ প্র্যাক্টিস'-এর সার্কুলার তাদের এই উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ২০৩০-র পরে 'সিঙ্গেল ইনস্টিটিউশন' বলে কিছু থাকবে না। সবটাই মূলত হবে 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অটোনমাস ইনস্টিটিউশন'। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত থাকতে হবে। পুঁজিপতিরা যা চাইবে সেভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলতে না চাইলে তাদের হঠে যেতে হবে। সরকার সেগুলোকে টাকা দেবে না। স্বভাবতই সেগুলো আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। সেই অনুযায়ী সমাজ মনন তৈরি করা হচ্ছে। যে কারণে ইতিমধ্যেই এ কথা চলে এসেছে যে, প্রথাগত শিক্ষা নিয়ে কী হবে? সরকারি চাকরি কোথায়? ছাত্ররা শিক্ষান্তে নিজেরাই নিজেদের কাজ দিতে পারবে এমন ধরনের চমক সৃষ্টিকারী নতুন নতুন কোর্স তৈরি করে ঝাঁ চকচকে ইনস্টিটিউশন গড়ে শিল্পপতিরা ছাত্রদের আকৃষ্ট করবে। ছাত্র-অভিভাবকরা সেই দিকে ছুটতে বাধ্য হবে। এই হল জাতীয় শিক্ষানীতির মূল চিন্তাভিত্তি। লক্ষ করা যাচ্ছে সরকারি প্রচারমাধ্যম সফল। এ বছর দীর্ঘ সময় দেওয়া সত্ত্বেও বহু কলেজে ছাত্র ভর্তি হয়েছে গত বছরের তুলনায় অনেক কম।

অনলাইন এডুকেশন ব্যবসাকে শিক্ষার মূলধারা করার দিকে এগোচ্ছে মোদি সরকার। মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এডুকেশনের কথা বলতে গিয়ে তারা ঋগবেদের কথা বলছে, ৬৪ কলার কথা বলছে। তারপর বলছে, এই বহুমুখী পড়াশুনা কেবল অফলাইন এডুকেশন দিয়ে হবে না। তাই অনলাইন এডুকেশন আনতে হবে। তারা নিয়ে আসছে 'প্রফেসর অফ প্র্যাকটিস'। মানে এমন ধরনের শিক্ষক, যিনি ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং সেখানে কোন ধরনের স্কিলড লেবার লাগবে তা তৈরি করার জন্য শিক্ষা দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তাদের ইউজিসি অনুমোদিত কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও চলবে। তারা ছাত্রদের শেখাবেন, কী করে একই সঙ্গে কারখানার ম্যানেজমেন্ট এবং শ্রমিকের কাজ করার দক্ষতা অর্জন করা যায়। এভাবেই ছোট ছোট শিল্প, কলকারখানা অল্প পুঁজি দিয়ে গড়ে তোলা এবং তা পরিচালনা করার উপযোগী শিক্ষা ছাত্ররা তাদের কাছ থেকে নেবে। যেহেতু এখনকার শিক্ষকরা এই জাতীয় শিক্ষা দিতে পারবে না, তাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষকদের আর প্রয়োজন হবে না। ফলে 'প্রফেসর অফ প্র্যাক্টিস'-এর মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের চাহিদা মতো শিক্ষক নিয়োগ হবে। এদের বেতন দেবে সংশ্লিষ্ট কলেজ। স্বভাবতই, ওই কোর্সগুলোর ব্যয়ভার বহন করতে হবে ছাত্রদেরকেই। সাধারণ কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, বাণিজ্য বিভাগগুলি ধীরে ধীরে উঠে যাবে। কারণ পুঁজিপতিদের স্বার্থে গড়ে তোলা এই শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব জ্ঞানচর্চার কোনও প্রয়োজন নেই এবং তা জাতীয় শিক্ষানীতির প্রণেতারা দেখছেন না।

এখন নানাভাবে সার্কুলার দিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চাপ দেওয়া হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ যদি কার্যকর না করা হয় তবে তাদের সমস্ত সরকারি অনুদান বন্ধকরে দেওয়া হবে। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম অর্থাৎ ভারতীয় জ্ঞানধারা নামে যা আনা হচ্ছে তা ছাত্রদের মগজে কুসংস্কার, অন্ধতা, উগ্র জাত্যাভিমান গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। পাশাপাশি বিজ্ঞানের নামে কিছু কারিগরি দিক শেখানো হবে। এভাবেই দেশে ফ্যাসিবাদের উপযোগী মনন তৈরি করতে মরিয়া কেন্দ্রের মোদি সরকার। আসল কথা, শিক্ষক-অধ্যাপক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানীরা এর বিপদ উপলব্ধি করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন।

শ্রমিক শ্রেণির অর্জিত অধিকার হরণের নীল-নক্সা

মালিক শ্রেণি তাদের স্বার্থে বহুদিন ধরেই প্রচলিত শ্রম-আইনগুলির পরিবর্তন দাবি করে আসছিল। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল, তাতে কংগ্রেস ও সিপিআই (এম) ও সিপিআই অংশগ্রহণ করেছিল। সেই সময় থেকেই নয়া আর্থিক নীতি, গ্যাট-চুক্তি ও এফ ডি আই কার্যকরী করার জন্য মালিক শ্রেণির পক্ষ থেকে জোরদার দাবি উঠতে থাকে। ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, কংগ্রেস নেতা বিজয় ভার্মার নেতৃত্বে দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম-কমিশন গঠন করে। এই শ্রম-কমিশন ২০০২ সালে দেশের সমস্ত শ্রম-আইনগুলিকে কোডে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব পেশ করে। সেই প্রস্তাবে মালিক শ্রেণির স্বার্থে শ্রমিকদের অধিকার হরণের বিষয়গুলি উল্লিখিত ছিল। ফলে ক্রমশই খসে পড়তে থাকে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মুখোশ। মালিক শ্রেণির স্বার্থে শ্রমিকদের অবাধ লুণ্ঠনের আইনি ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে। এরই ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত মোদি সরকার করোনা অতিমারির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, পার্লামেন্টে বিরোধীদের আলোচনার সুযোগ না দিয়ে ২৯টি শ্রম-আইন বাতিল করে ২০১৯-এর ৮ আগস্ট ১টি কোড এবং ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বাকি ৩টি কোড অর্থাৎ মোট ৪টি শ্রম-কোড অগণতান্ত্রিকভাবে পাশ করিয়েছে।

১) 'কোড অন ওয়েজেস' ঃ মজুরি সংক্রান্ত এই কোডে শ্রমিক শ্রেণির উপর মারাত্মক আঘাত হানা হয়েছে ৯ নং ধারায় 'ফ্লোর লেভেল ওয়েজ' নামে বেতনের নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই 'ফ্লোর ওয়েজ' প্রচলিত ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম। ন্যূনতম মজুরি হল জীবন ধারনের উপযোগী সরকার স্বীকৃত ন্যূনতম বেতন। এর চেয়ে কম বেতন দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তার হাত থেকে মালিকদের মুক্ত করা এবং তাদের আরও বেশি মুনাফার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এই 'ফ্লোর লেভেল ওয়েজ'-এর সৃষ্টি। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি ও চরম বেকারত্বের বাজারে এই 'ফ্লোর লেভেল ওয়েজ' প্রবর্তন বাস্তবে শ্রমিক জীবনে নিয়ে আসবে অর্ধাহার, অনাহার, অপুষ্টিজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যু।

এই কোডে মজুরির সংজ্ঞা থেকে 'ঘরভাড়া ভাতা' বাদ যাওয়ায় পিএফ, ইএসআই, বোনাস, গ্রাচ্যুইটিতে মালিকের দেয় অর্থের পরিমাণ কমবে। শ্রমিকরা আর্থিকভাবে আবারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মালিকদের লাভের অঙ্ক বাড়বে। কোডের '২কে' ধারায় এমপ্লয়ি'র সংজ্ঞা থেকে 'আউট ওয়ার্কার' (যারা মালিকের উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করে না, কাঁচামাল নিয়ে এসে নিজের ঘরে বা অন্যত্র কাজ করে) তাদের বাদ দেওয়ায় বহু শ্রমিক শ্রম-আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। পূর্বের শ্রম-আইনে শ্রমিকদের এই অধিকার ছিল।

২) শিল্প সম্পর্ক কোড ঃ এই কোডে আনা হয়েছে 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট' তথা চুক্তিভিত্তিক ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্থায়ী কাজ— যা স্থায়ী কাজকেই বিলোপ করে দেবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর চাকরি হারানোর ফতোয়া থাকায়— মালিকদের চূড়ান্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলন দুর্বল হবে। ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা কঠিন হবে।

এই কোডের '২ জেড আর' ধারায় সুপারভাইজারিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হয়নি। ফলে শ্রমিক হিসাবে প্রাপ্য সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। ৭৭(১), ৭৮, ৭৯, ৮০ ধারা অনুযায়ী ২৯৯ জন পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করে এমন উৎপাদন সংস্থার মালিকরা সরকারি অনুমতি ছাড়া খুশিমতো শ্রমিক ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট করা ও ক্লোজার করার অধিকার পাবে। অথচ প্রচলিত আইন আইডি অ্যাক্ট-১৯৪৭-এর '২৫আর' ধারা অনুযায়ী ১০০ বা তার বেশি কাজ করে এমন সংস্থায় শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী এই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি ছিল বাধ্যতামূলক। আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশীয় শিল্পে এই নতুন নিয়ম চালু হলে ৭৪ শতাংশ শ্রমিকের উপর মালিকরা অবাধে ছাঁটাই, ক্লোজার, লে-অফ, লক-আউটের খাঁড়া নামিয়ে আনবে। এই কোডের ২৪(১) ধারা অনুযায়ী ৩০০-এর কম শ্রমিক বিশিষ্ট শিল্পসংস্থায় 'স্ট্যান্ডিং অর্ডার' কার্যকরী হবে না।

৪টি শ্রম কোড

ফলে একটি বিরাট অংশের শ্রমিক বেতন, ছুটি, হাজিরা ও কাজের শর্তাবলি নির্ধারণের জন্য দর-কষাকষির অধিকার হারাবে। এই কোডের ৬২(১) ধারা অনুযায়ী শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারকে নানা নিয়মের বেড়াজালে ফেলে খর্ব করা হয়েছে। ধর্মঘট করতে হলে ১৪ দিন আগে শ্রমিক ইউনিয়নকে নোটিশ দিতে হবে। অথচ প্রচলিত আইনে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া অন্য কোথাও নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। নোটিশ ছাড়া ধর্মঘট করলে কোড অনুযায়ী তা বেআইনি ঘোষিত হবে। আবার শ্রমিকদের দাবি নিয়ে কর্তৃপক্ষ বা সরকারি স্তরে আলোচনা শুরু হলে ধর্মঘট করা যাবে না। ফলে আলোচনা দীর্ঘায়িত করে ধর্মঘটে বাধা দেওয়া হবে। এমনকি অর্ধেকের বেশি শ্রমিক একসাথে ছুটি নিলেও মালিক পক্ষ ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

৩) অকুপেশনাল সেফটি হেলথ অ্যান্ড কন্ডিশন অফ ওয়ার্ক কোড ঃ এই কোড অনুযায়ী কোনও বিদ্যুৎ চালিত উৎপাদন সংস্থায় ১৯ জন শ্রমিক এবং বিদ্যুৎচালিত নয় এমন সংস্থায় ৩৯ জন শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে শ্রমিকরা শ্রম-আইনের কোনও সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। প্রচলিত আইনে বিদ্যুৎ চালিত সংস্থায় ১০ জন এবং বিদ্যুৎ চালিত নয় এমন সংস্থায় ২০ জন থাকলে শ্রমিকরা শ্রম-আইনের সুযোগ পেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি এই শ্রম-কোড কর্পোরেটদের স্বার্থেরই পরিপূরক।

এই কোড অনুযায়ী কোনও কনট্রাক্টর ৫০ জন শ্রমিক নিয়ে কাজ করতে চাইলে তার লাইসেন্স লাগবে। যদিও বর্তমান আইনে ২০ জন শ্রমিক নিয়ে কাজ করতে হলেই লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। ফলে নতুন কোডে কনট্রাক্টরা লাইসেন্স ছাড়াই পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশি শ্রমিককে নিয়ে কাজ করার আইনি সুযোগ পাবে।

এই কোডের ৪৯ ধারা অনুযায়ী ৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করেন এমন সংস্থায় এই কোড কার্যকরী হবে না। পুরনো আইনে তা ৫ জন বলা ছিল। ২০১৩-১৪ ইকনমিক সেনসাস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৭০শতাংশ সংস্থায় ৬ জনের কম পরিযায়ী শ্রমিক নিযুক্ত। এই ধরনের সংস্থায় বর্তমানে পরিযায়ী শ্রমিকরা যতটুকু শ্রম-আইনের সুযোগ-সুবিধা পায়, নতুন শ্রম-কোড চালু হলে তারা শ্রম-আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

শ্রম-কোডে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা আহত হওয়ার ঘটনায় নোটিশ পাওয়ার ২ মাসের মধ্যে তদন্ত করার উল্লেখ আছে, যেখানে প্রচলিত ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্টে ওই সময়সীমা ১ মাস। এর ফলে নতুন কোডে এই রকম বিপজ্জনক ঘটনায় দ্রুততার সাথে তদন্তের প্রশ্নটি লঘু হয়ে যাচ্ছে। শ্রম-কোডের ৩৪-৪২ নং ধারায় ইন্সপেক্টর পদ উঠিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর কাম ফেসিলিটেটর পদ আনা হচ্ছে এবং তাঁদের নিয়মিত মালিকদের কাজ পরিদর্শন করার অধিকার লঘু করা হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ পাওয়া দীর্ঘায়িত হবে। ইন্সপেক্টররা সরকারের আগাম অনুমতি ছাড়া বিনা নোটিশে পরিদর্শন করতে পারবেন না। তাছাড়া অন-লাইন পরিদর্শনে গুরুত্ব দিয়ে মালিকদের বেনিয়ম আড়াল করার সুযোগ প্রসারিত হবে।

শ্রম-কোডে স্থায়ী কাজে, এমনকি কোর অ্যাক্টিভিটিতেও ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের বিধি-নিষেধ তুলে দিয়ে ঠিকাকরণের ক্ষেত্রকে ব্যাপক সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যালাউন্স তুলে দিয়ে তাদের প্রচলিত আর্থিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

৪) সোস্যাল সিকিউরিটি কোড ঃ এই কোড শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের পরিসর সংকুচিত করবে। সামাজিক সুরক্ষা থেকে বহু শ্রমিককে বঞ্চিত করবে। অন্যদিকে নিয়োগকর্তা, ঠিকাদারদের হাত শক্ত করবে। ত্রিপাক্ষিক কমিটিগুলিকে এড়িয়ে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে পদদলিত করে এই কোড নির্মাণ, বিড়ি সহ নানা কল্যাণ তহবিল, পিএফ, ইএসআই সহ বিভিন্ন তহবিলে সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করবে। যদিও ওই সমস্ত তহবিলগুলিতে সরকারের কোনও অনুদান নেই। এই কোডে পিএফ-এ দেয় অর্থের পরিমান ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করায় ওই তহবিলে ৪ শতাংশ অর্থ কমছে। ইএসআই-এর গুরুত্ব নানাভাবে লঘু করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার বলছে এই শ্রম-আইন সংস্কার দেশে ব্যবসার পথ মসৃণ করবে। যার ফলে ভারত বিশ্বের প্রথম ১০টি উন্নত দেশের মধ্যে চলে আসবে। ব্যবসার এই অগ্রগতিতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড় বাড়বে। একচেটিয়া মালিকদের দেশে এবং বিদেশে খাটা লগ্নি-পুঁজির বিশাল অগ্রগতি একমাত্র সম্ভব দেশের শ্রমিকদের ওপর শোষণ তীব্রতর করেই। তার জন্য এই শ্রম-আইন সংস্কার। বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিনিময়ে একদিন প্রচলিত শ্রম-আইনগুলি শ্রমিকরা অর্জন করেছিল। আজ তা কেড়ে নিচ্ছে বিজেপি সরকার। এআইইউটিইউসি সহ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোচ্চার।

ভিঝিনজাম আন্দোলন দমন করার ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ নিন্দনীয়

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর কেরালা রাজ্য কমিটি ২৪ নভেম্বর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভিঝিনজামে পরপর যে দুঃখজনক ঘটনাগুলি ঘটেছে তা উপকূলবর্তী এলাকায় জীবন ধ্বংসকারী নির্মীয়মান আদানি পোর্টের বিরুদ্ধে মৎস্যজীবীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে দমন করার জন্য রাজ্য সরকারের হীন ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপেরই ফল। বিগত কয়েক মাস ধরে যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছিল তাকে ধ্বংস করার জন্য সরকার দুরভিসন্ধি নিয়ে উক্ত এলাকায় আদানি বন্দরের যান চলাচলের অনুমতি দেয়। স্বাভাবিকভাবেই মৎস্যজীবীরা পথ অবরোধ করে তাদের আটকায়। এই সময় পুলিশের সহযোগিতায় গুন্ডাবাহিনী মৎস্যজীবীদের উপর ব্যাপক হামলা চালায়। পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ এত উদ্ধত হয়ে ওঠে যে, যারা আন্দোলনের সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন না তাদেরও গ্রেপ্তার করে। যারা তাঁদের জামিনে মুক্ত করার জন্য থানায় যান, তাঁদেরও গ্রেফতার করা হয়। শুধু তাই নয়, এই আন্দোলনে সহযোগিতার কারণে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বিশপের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ মৎস্যজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থানা ঘেরাও করে। এরপর দু'পক্ষের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন মৎস্যজীবী এবং পুলিশ আহত হয়। এই ঘটনাকে দেখিয়ে মৎস্যজীবীরা হিংসাত্মক হয়ে উঠছে অভিযোগ এনে পুলিশকে ব্যবহার করে জনগণ এবং আন্দোলনকারীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকার ইন্দোনেশিয়ার একচেটিয়া পুঁজিপতি সালিম গোষ্ঠীর স্বার্থে যেভাবে জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করেছিল, কেরালায় আদানিদের স্বার্থে সিপিএম সরকারের এই জঘন্য পদক্ষেপ জনগণের আন্দোলনকে দমনের সেই নির্মম ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

আদানিদের স্বার্থে বিজেপির সাথেও হাত মেলাতে প্রস্তুত সিপিএম। এতে বোঝা যায় তারা কতটা কর্পোরেট পুঁজির দাসত্ব করছে। তারা আন্দোলনকে ভাঙার জন্য এমনকি সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছে। যা কিনা পরবর্তী সময়ে কেরালার রাজনৈতিক পরিবেশের বিরাট ক্ষতি করবে। আন্দোলনের নেতৃত্বকে কলঙ্কিত করার জন্য সিপিএম লাগাতার কুৎসিত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সাতটা দাবির মধ্যে ছ'টা গৃহীত হয়েছে, এই মিথ্যা কথা বলে সরকার সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কেরালা রাজ্য কমিটি সরকারের কাছে এমন ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা এবং জনগণের ন্যায্য দাবির সঠিক মীমাংসা করার দাবি জানাচ্ছে। তারই সাথে দল কেরালা উপকূল রক্ষার লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কেরলের সমস্ত সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

কমরেড অনীশ রায়ের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য, শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা, দলের ইংরাজি মুখপত্র 'প্রোলেটারিয়ান এরা'র একনিষ্ঠ লেখক-কর্মী কমরেড অনীশ রায় জটিল টিবি, কিডনির সমস্যা ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৯ নভেম্বর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

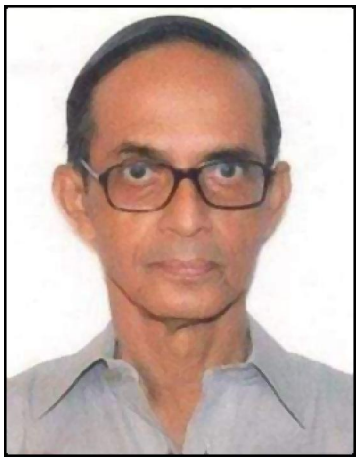

১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জীর মাধ্যমে কমরেড অনীশ রায় দলের সংস্পর্শে আসেন। প্রথমে তিনি পথিকৃৎ-এর সঙ্গে যুক্ত হন। পথিকৃৎ-এ তিনি দলের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বর্তমানে পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। কমরেড মানিক মুখার্জীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দলেরও গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হয়ে ওঠেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি এর অনুশীলন শুরু করেন। দলের সাথে একাত্ম হওয়ার সংগ্রামে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। তাঁকে পথিকৃৎ সংগঠনের পার্টি ইউনিটের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তিনি উজ্জ্বল অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের অধিকারী ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি ভূ-তত্ত্ব নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করার কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার প্রখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে তিনি জীবাশ্ম বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। সরল অমায়িক ব্যবহার ও নিজের বিষয়ের উপর অগাধ জ্ঞান এবং আকর্ষণীয় শিক্ষণ পদ্ধতির জন্য তিনি ছাত্রদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হয়ে ওঠেন। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখার তাঁর সাবলীল দক্ষতা ছিল। দলের আদর্শ অনুশীলনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁর কলম ক্রমাগত পরিশীলিত হয়ে উঠতে থাকে। তিনি নবগঠিত সরকারি কলেজ শিক্ষক সংগঠনে যুক্ত হয়ে কলেজ শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলনে সামিল হন। কমরেড অনীশ রায় তাঁর চাকরিজীবন এবং পার্টিজীবনকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। সহকর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে দলের রাজনীতি ও আদর্শ নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর নিয়মিত চেষ্টা ছিল।

দলের রাজনীতি ও আদর্শের চর্চা ও তার প্রকাশভঙ্গিমা আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে তিনি দলের বাংলা মুখপত্র গণদাবীর লেখক প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত হন। নেতৃত্বের গাইডেন্সের ভিত্তিতে দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের খসড়াও তিনি রচনা করেন। ২০০৩-এর মাঝামাঝি থেকে পলিটবুরোর সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে তিনি দলের ইংরেজি মুখপত্র 'প্রোলেটারিয়ান এরা'য় লেখার দায়িত্ব পান। দল এবং দলের নেতৃত্বের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল শিক্ষণীয়। তার রূপ এমনই ছিল যে, বয়সে অনেক ছোট এমনকি তাঁর ছাত্রের নেতৃত্বেও কাজ করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আনন্দের সাথে। একসাথে অনেক দায়িত্ব এলেও নিঃশব্দে নীরবে তার সবগুলি পালন করার জন্য সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর মধ্য দিয়ে তিনি দলের আদর্শগত সংগ্রামে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁর স্ত্রী ও ছোট বোনকে তিনি দলে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সন্তানরাও দলের সমর্থকে পরিণত হয়েছেন। তাঁর পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রদের মধ্যে তিনি দলের আদর্শ সঞ্চারিত করেছেন। বিদেশে বসবসকারী বহু ছাত্রের সাথে তিনি নিয়মিত রাজনৈতিক মতামত বিনিময় করতেন।

২০১৪-র নভেম্বরে কমরেড গৌরীশঙ্কর ঘটকের মৃত্যুর পর অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে তিনি নির্বাচিত হন। শিক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজেও দক্ষতার পরিচয় দেন তিনি। দেশের অন্যান্য অগ্রগণ্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সাথে নিবিড় সংযোগ গড়ে তুলে তিনি সরকারের সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধ আন্দোলনে অগ্রগণ্য ভূমিকা নেন। তাঁর নেতৃত্বে সেভ এডুকেশন আন্দোলন গতিলাভ করে এবং রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই কাজে তাঁর সাফল্যের ফলে শিক্ষাবিদ-শিক্ষানুরাগী মানুষ তাঁকে ২০২১-এ দ্বিতীয়বার সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য উপেক্ষা করে সেভ এডুকেশন আন্দোলনকে সংহত করতে তিনি দেশের নানা প্রান্তে ঘুরেছেন। এমনকি হাসপাতালের শয্যা থেকেও তিনি চিকিৎসকদের অনুমতি নিয়ে অনলাইন সেমিনার ও শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচিতে অংশ নেন।

নম্র ও বিনয়ী ব্যবহার এবং হৃদয়ের কোমলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য। এই নিরহঙ্কার মানুষটিকে বাইরে থেকে দেখে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, বিপ্লবী চরিত্রের বর্ণময়তা সবসময় বোঝা যেত না। অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য অনেকসময় তিনি প্রকাশ্য সভার মঞ্চে বিশেষ আসতে চাইতেন না, কিন্তু পার্টি যখন চেয়েছে তিনি তাঁর কুণ্ঠার বেড়া ভেঙে দলের সিদ্ধান্তকে হাসিমুখে কার্যকর করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল অত্যন্ত মূল্যবান একজন নেতৃস্থানীয় সংগঠককে, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন বঞ্চিত হল এক দক্ষ নেতৃত্ব থেকে।

কমরেড অনীশ রায় লাল সেলাম

সুইগি, জোম্যাটো কর্মীরা লাগাতার আন্দোলনে

সুইগি, জোম্যাটো প্রভৃতি অনলাইন অ্যাপ-নির্ভর খাদ্য পরিবহণ সংস্থার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে চলেছে শহরাঞ্চলে। হাজার হাজার যুবক এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এই পেশা সংক্রান্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় এইসব অ্যাপভিত্তিক সংস্থার কর্মীরা চরম বঞ্চনার শিকার। এদের পরিষেবাকে ব্যবহার করে সংস্থার মালিকরা বিপুল মুনাফা করছে। কিন্তু শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম মজুরিটুকুও দিচ্ছে না। ভারতের বিভিন্ন শহরে এদের দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-বঞ্চনা আন্দোলন রূপে ফেটেও পড়ছে। এই আন্দোলনের যতটুকু সংবাদ সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কেরালায় এই আন্দোলন অনেকটাই গতি পেয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশেও আন্দোলন চলছে।

কেরালার কোচি শহরে সুইগি-কর্মীরা নভেম্বর মাসে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। দাবি, বেতন বৃদ্ধি। তাঁদের এক প্রতিনিধি সাংবাদিকদের বলেছেন, বর্তমানে আমরা চার কিলোমিটারের মধ্যে প্রতিটি ডেলিভারির জন্য ২০ টাকা পেয়ে থাকি। আমাদের দাবি, তা ৩৫ টাকা করতে হবে। বর্তমানে পেট্রলের যা দাম, তাতে এই টাকায় আমরা সংসার চালানোর খরচটুকুই রোজগার করতে পারছি না।

তিরুবনন্তপুরমেও ধর্মঘট হয়েছে গত আগস্টে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বেতন বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও তা কার্যকর করেনি, জানিয়েছেন শ্রমিকরা। এক শ্রমিক জন মিল্টন বলেন, ২০১৯-এ আমি কাজে যোগ দিয়েছি। তখনকার বেতনের সাপেক্ষে এখন বেতন প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে। সারাদিনে ১৫, ১৬টা ট্রিপে ৩০০-৪০০ টাকা রোজগার হয়। অন্যান্য শহরে যতটুকু বা দেওয়া হত, কোচিতে তা অত্যন্ত কম। এই টাকায় সংসার চলে!

কোচিতে সুইগির ৫০০ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। আন্দোলনের চাপে ডিস্ট্রিক্ট লেবার অফিসার হস্তক্ষেপ করলেও মালিকরা কোনও দাবিই মানছে না। কারণ এক্ষেত্রে এই শ্রমিকদের পক্ষে কোনও আইনি রক্ষাকবচ নেই। আন্দোলনকারী শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করে অ্যাপ-নির্ভর শ্রমিকদের নিরাপত্তা দাবি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই মামলার অন্যতম পক্ষ হলেও আজও এ বিষয়ে তারা আদালতে কোনও হলফনামা পেশ করেনি। রাজ্যে ক্ষমতাসীন সিপিএম সরকারও এই শ্রমিকদের আইনি সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে তৎপর হচ্ছে না।

কোচিতে ১২ নভেম্বর ধর্মঘট হয়। এক শ্রমিক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে ১৪ নভেম্বর কোচির মেরিন ড্রাইভে সুইগির চার অফিসার, লেবার অফিসার এবং ধর্মঘটী শ্রমিক নেতাদের মিটিং হয়। কিছু ছোটখাটো দাবি আদায় হলেও বেতন বৃদ্ধির মতো মূল দাবিগুলি অপূরিতই থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হল, লেবার অফিসার ধর্মঘট তুলে নেওয়ার জন্য বারবার শ্রমিকদের বলতে থাকেন। লেবার অফিসার কী করে ধর্মঘট তোলার কথা বলতে পারে? এটা আমাদের বললেন বাসিল। লেবার অফিসার বেতন বাড়াতে সুইগিকে বলছে না কেন?

সুইগি, জোম্যাটো, উবের, ওলা প্রভৃতি অ্যাপভিত্তিক কোম্পানিগুলি শ্রমিক অধিকার লংঘন করার জন্য প্রবল ভাবে সমালোচিত। হায়দরাবাদে ২৭ দিন ধরে ধর্মঘট হয়েছে। কিন্তু সরকার কোনও আইন প্রণয়ন না করলে এই কোম্পানিগুলি শ্রমিকদের দাবিগুলির কোনও তোয়াক্কাই করছে না। 'আনঅর্গানাইজড সোস্যাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট- ২০০৮' অনুযায়ী এই অ্যাপভিত্তিক শ্রমিকদের মজুরি শ্রমিক হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। এই দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশনও দাখিল হয়েছে। কিন্তু কি সরকার, কি ওই চার কোম্পানি— কারওর কোনও হেলদোল নেই। এখানেই প্রয়োজন শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধতা, সংগঠন এবং আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহসিকতা, তৎপরতা। কেন্দ্রীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগঠনগুলির এ ব্যাপারে কোনও ভূমিকা কি নেই?

বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভ

২৯ নভেম্বর বাঁকুড়ায় জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরে বিভিন্ন দাবিতে অ্যাবেকার নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান বিদ্যুৎগ্রাহকরা। বিদ্যুৎ বিল-২০২২ অবিলম্বে প্রত্যাহার, রবি ও বোরো চাষ এবং স্কুল-কলেজের পরীক্ষা চলাকালীন বিদ্যুৎ পরিয়েবার উন্নতির দাবি জানানো হয়। দ্রুত নতুন সংযোগ দেওয়া, বন্ধ ও পোড়া মিটার দ্রুত পাল্টানো, স্মার্ট প্রিপেড মিটার বাতিল, গ্রাহকদের ফোনে বিদ্যুৎ দপ্তরের নামে ভুয়ো মেসেজ পাঠানোর তদন্ত, কৃষিতে অসংশোধিত বিল নিয়ম মাফিক সংশোধন, এককালীন বিল ছাড়ের সার্কুলার সঠিক ভাবে কার্যকর করা প্রভৃতি দাবিতে বক্তব্য রাখেন গ্রাহক নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের জেলা সভাপতি ও সম্পাদকের নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি দেয়। তিনি দাবিগুলি সুরাহার আশ্বাস দেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

পাঞ্জাবের জলন্ধরে গদর আন্দোলন বার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত মেলায় এসইউসিআই (সি) এবং এআইডিএসও-র বুক স্টল

হরিয়ানায় এআইকেকেএমএস-এর সম্মেলন

এআইকেকেএমএস-এর অষ্টম হরিয়ানা রাজ্য সম্মেলন ৪-৫ ডিসেম্বর ঝজ্জরে অনুষ্ঠিত হল। ৪ মার্চ প্রকাশ্য সমাবেশে রাজ্যের ১৪টি জেলার দুই সহস্রাধিক কৃষক ও খেতমজুর অংশগ্রহণ করেন। সভায় কৃষক জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ ও সভাপতি কমরেড সত্যবান। সম্মেলনে কমরেড অনুপ সিং-কে সভাপতি ও জয়করণ মান্দোথিকে সম্পাদক করে ৫৪ জনের এক শক্তিশালী রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে।

মিড মিল কর্মীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি

মিড ডে মিল কর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, বেতন বৃদ্ধি, বছরে বারো মাসের বেতন দেওয়া হয় বছরে দশ মাসের। অন্য কেন্দ্রীয় স্কিমের আওতাভুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নার কাজ করেন যে সহায়িকারা, তাঁরা মাসে বেতন পান ৬৩০০ টাকা। মিড ডে মিল কর্মীর প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়টি তুলে ধরলে আধিকারিক সহমত পোষণ করেন। মিড ডে মিল কর্মীদের জন্য খাবার বরাদ্দ না থাকার বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের জুলাই মাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হুগলির গুড়াপে এক প্রশাসনিক সভায় মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করে ৬০০০ টাকা করবার আশ্বাস দিলেও তার কিছুই হয়নি। ডাইরেক্টর দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে তা বাস্তবায়িত করার আশ্বাস দেন। সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্রুত দাবি মেনে না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

সহ সাত দফা দাবিতে প্রজেক্ট ডাইরেক্টরের কাছে এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় ৩০ নভেম্বর। স্মারকলিপি নিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাসের নেতৃত্বে তিনজনের প্রতিনিধিদলের সাথে ডাইরেক্টরের দীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলা হয়, এ রাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীদের মাসিক বেতন মাত্র দেড় হাজার টাকা, যা কেরালা, তামিলনাড়ু, হরিয়ানার তুলনায় অনেক কম। এছাড়াও বেতন

জ্বরে রক্ত পরীক্ষার তারিখ পেতে ২২ দিন!
আন্দোলনের চাপে শুরু চিকিৎসা

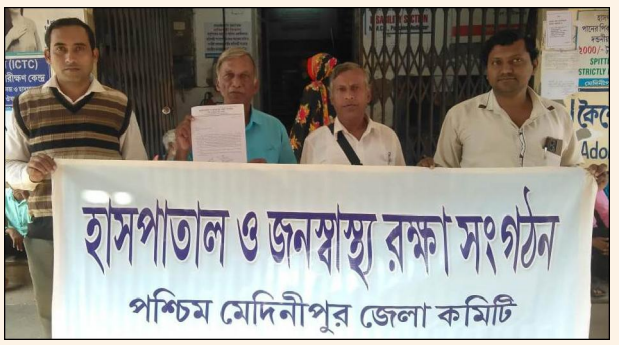

রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার হাল কী? একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ২৮ নভেম্বর মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১ বছর ৯ মাসের শিশু অঙ্কুশ চালককে জ্বরের চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তার বাবা, মা। শিশু বিভাগের চিকিৎসক জ্বরের চিকিৎসার জন্য শিশুটির ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া সহ কয়েকটি রক্ত পরীক্ষা ও এক্স-রে করার নির্দেশ দিলে হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগ তার পরীক্ষার তারিখ দেয় ২২ দিন পর, ২০ ডিসেম্বর। এই দরিদ্র পরিবারের পক্ষে প্রাইভেটে পরীক্ষা করানোও সম্ভব নয়। তাঁদের আবেদন শুনে এগিয়ে আসে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন। সংগঠনের সদস্যরা ২৯ নভেম্বর হাসপাতালে এমএসভিপি-র কাছে অবিলম্বে ওই শিশুটির রক্ত ও অন্যান্য পরীক্ষার দাবি জানান। তাঁরা বলেন শুধু এই শিশুটি নয় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এটাই চিত্র। এমআরআই সিটিস্ক্যান বা একটু বড় কোনও পরীক্ষা করাতে মাসের পর মাস চলে যায়, সাধারণ রক্ত পরীক্ষা এক্স-রে তে লাগে অন্তত একমাস।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষে ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি জানান, আন্দোলনের চাপে শিশুটির এক্স-রে ও রক্ত পরীক্ষা সেদিনই হয়। অবস্থা বদলাতে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য হাসপাতালে আসা রোগীর পরিজনদের কাছে আবেদন করেন সংগঠনের সদস্যরা।

রেল কলোনির বাসিন্দাদের উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন

কিছু দিন আগে রেলের পক্ষ থেকে উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হয় কলকাতার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে কাশীপুর ঘোষবাগান অঞ্চলের রেল কলোনির বাসিন্দাদের। জমি ছাড়ার কথা বলা হলেও রেলের তরফ থেকে কোনও পুনর্বাসনের কথা বলা হয়নি। এই নির্দেশের প্রতিবাদে ২৮ নভেম্বর নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের নেতৃত্বে কলোনির বাসিন্দারা শিয়ালদহ ডিআরএম অফিসে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেন।

শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালের সামনে প্রায় পাঁচ শতাধিক কলোনিবাসী মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খল মিছিল সহকারে ডিআরএম অফিসের সামনে উপস্থিত হন। সেখানে উপস্থিত আরপিএফ বাহিনী বাধা দিলে গেটের সামনেই প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল অধ্যাপক মেঘবরণ হাইতির নেতৃত্বে ডেপুটেশন দিতে যান। ডিআরএম উচ্ছেদের পক্ষে বক্তব্য রাখলে অধ্যাপক হাইতি জোরালো প্রতিবাদ জানান এবং হুঁশিয়ারি দেন উপযুক্ত পুনর্বাসন ও জীবিকার সংস্থান ছাড়া যদি এই উচ্ছেদের জন্য রেল সক্রিয় হয় তবে এর বিরুদ্ধে তীব্রতর আন্দোলন গড়ে উঠবে এবং রক্তক্ষয়ী আন্দোলন চলবে। বিক্ষোভ সভায় কলোনিবাসী মহিলারা এই নোটিসের বিরুদ্ধে তাঁদের তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁরা বলেন, পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ তাঁরা কোনও ভাবেই মানবেন না।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মেঘবরণ হাইতি

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com